

www.BanglaBook.org

মাসুদ রানা



বিদেশী বৈজ্ঞানিক

অরুণী আনোয়ার হোসেন

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিদেশি বৈজ্ঞানিক



এক

সকাল সাড়ে দশটা। একটু আগেই থেমেছে অসময়ের টিপ-টিপ বৃষ্টি। একটানা উত্তরে হাওয়ায় বঙ্গোপসাগরের দিকে ফিরে চলেছে ধূসর মেঘের দল, ভেজা কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে জবুথবু হয়ে আছে শীতের আকাশ।

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর হেডকোয়ার্টার।

দেশের বিরুদ্ধে দুনিয়ার কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র হলে সেটা নস্যাৎ করবার জন্য গড়া হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। সেই পাকিস্তানী আমলে আর্মি থেকে রিটারার করবার পরপরই প্রায় জোর করে এই সংস্থাটি পরিচালনার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তীক্ষ্ণদী মেজর জেনারেল রাহাত খানের উপর—আজও, দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরও, আছেন তিনি সেই একই পদে। নিজ তত্ত্বাবধানে মনের মতন করে গড়ে-পিটে নিয়েছেন তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন শাখার দুর্ধর্ষ কয়েকশো যুবককে। চোখ-কান খোলা রেখে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের দক্ষ এজেন্টরা। দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিলেই প্রাণের পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সে-ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে। শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও শত্রু-সমীহ কেড়েছে অকুতোভয় এইসব বাঙালি ছেলেরা।

কনফারেন্স হল।

কালো চামড়ার গদিমোড়া চেয়ারে বসে সামনে দাঁড়ানো তরুণের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, মন দিয়ে শুনছেন বিসিআই-এর প্রথমসারির কয়েকজন এজেন্ট-এর প্রশ্নের জবাবে কী বলে তরুণ। চুরুট নিভে গেছে তাঁর, সেদিকে খেয়াল নেই।

বিশাল ঘরটাতে বিরাজ করছে পরীক্ষা-হলের থমথমে চাপা

উত্তেজনা।

পাশাপাশি তিনটে চেয়ারে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইভা-ভোচির মত করে ক্যাপ্টেন তারেক মাহমুদের পরীক্ষা নিচ্ছে সলিল সেন, সোহানা ও রূপা। ইন্টারভিউ-এর প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ওরা। পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত রয়েছে বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। দুর্দান্ত এজেন্ট ছিল সে একসময়, দুর্ঘটনায় একটা হাত কাটা পড়ায় এখন বিসিআই-এ প্রশাসনের দায়িত্বে কাজ করছে। চিফের পাশেই একটা চেয়ারে বসে আছে সে চুপচাপ।

আর্মি ও ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স থেকে চৌকশ দশজন তরুণ অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল তিনমাস ব্যাপী বিসিআই ফিল্ড এজেন্টস' ট্রেইনিং-এ অংশ নেবার জন্য। সবাই আসতে চায়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণরা বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দিতে চায়, বিপজ্জনক সব মিশনে অংশ নিয়ে প্রমাণ করতে চায় নিজ-নিজ সততা ও যোগ্যতা। ট্রেইনিং শেষে দশজন তরুণ অফিসারের মধ্য থেকে সন্তোষজনক ফলাফল করতে পেরেছে মাত্র দুজন: ক্যাপ্টেন তারেক মাহমুদ তাদেরই একজন। আনআর্মড কমব্যাট, রাইফেল ও পিস্তল শুটিং, দৈহিক শক্তি ও এনডিউর্যান্স, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, অনুসরণের দক্ষতা, ক্যামেরা-ওয়ায়েরলেস-কমপিউটার সহ বিভিন্ন গ্যাজেটস ব্যবহারে পারদর্শিতা ইত্যাদি নানান বিষয়ের পরীক্ষায় বেশ ভাল করেছে সে। খুব অল্প সময়েই কাজ চালাবার মতো শিখে নিয়েছে কয়েকটি ভাষা; সেইসঙ্গে ইউরোপিয়ান, আমেরিকান ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের কালচার, চালচলন ও রীতিনীতি শিক্ষায় প্রমাণ করেছে নিজের যোগ্যতা। আশা করা যায়, বিদেশে অ্যাসাইনমেন্টে গেলে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে ও পরিবেশের সঙ্গে।

আজকের পরীক্ষায় উতরে গেলে বাংলাদেশ কাউন্টার

ইন্টেলিজেন্সের ফিল্ড এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ পাবে ও, আরও উন্নত ট্রেইনিঙের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে পাঠানো হবে ওকে হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য।

উত্তেজিত, সতর্ক চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বিসিআই-এ যোগ দিয়ে দেশসেবার সুযোগ পাওয়ার জন্য কী পরিমাণ উদগ্রীব হয়ে আছে এই স্বাস্থ্যবান, টগবগে তরুণ।

‘এবার দেখা যাক কুইক অবয়ারভেশন ট্রেইনিং তোমাকে কী শেখাল,’ ক্যাপ্টেন মাহমুদের চোখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল সলিল সেন। ‘দরজার কাছে চলে যাও। ওখানে একটা পিপহোল আছে। ওটা দিয়ে ঠিক পাঁচ সেকেন্ড তাকানোর সুযোগ পাবে তুমি। যা দেখবে, দেখে যা বুঝবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট করতে হবে পরীক্ষকদের সামনে।’

দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেল ক্যাপ্টেন দরজার সামনে, চোখ রাখল পিপহোল-এ।

ঘড়ির দিকে তাকাল সলিল, পাঁচ সেকেন্ড পর টিং শব্দে বাজাল একটা ঘণ্টি, ‘সময় শেষ।’

ফিরে এসে টেলিফোনের খুঁটির মত অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে সামনের নীলরঙা দেয়ালের দিকে।

নীরবতা ভাঙল সলিল, ‘কী দেখলে বলো।’

‘ওটা আউটার লাইট,’ আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। ‘একজন লোক পায়চারি করছে ওখানে। লাইটের দেয়াল হলদে রঙের...’

‘ওসবের বর্ণনা থাক,’ বাধা দিল রূপা, ‘ওই লোকটার বর্ণনা দাও।’

শুরু করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ: ‘পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, বা ছ’ফুট হবে লোকটা লম্বায়, ওজন অন্তত দু-শো আশি পাউন্ড। সস্তা বেল্টের ওপর দিয়ে উপচে পড়েছে বিশাল ভুঁড়ি। কাঁধদুটো

গোলচে। ঘাড় প্রায় নেই বললেই চলে। যতটুকু আছে, সেটা লাল একটা ময়লা মাফলার দিয়ে ঢাকা। মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাইনি। ...চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। খুঁড়িয়ে হাঁটে। বামপায়ে সমস্যা আছে।’

‘গুড,’ কৃতী-ছাত্রের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে মৃদু হাসল সলিল। ‘এবার জামা-কাপড়ের বর্ণনা শোনা যাক।’

‘মাফলারটা বেশ পুরনো। কোটও তা-ই। ইস্ত্রি করা দরকার ওটা। প্যান্টও পুরনো, বেশি আঁটো, শার্টের একটা বোতাম নেই। পাম্পশু কালো রঙের। মনে হলো, প্লাস্টিকের তৈরি খুবই সস্তা জিনিস। রাজমিস্ত্রি বা জোগালেরা সাধারণত যেরকম পরে।’ সলিলের দিকে তাকাল তারেক মাহমুদ।

‘এবার ওই লোকের বয়স ও পেশা সম্বন্ধে তোমার ধারণা বলো।’

‘বয়স ঠিক বোঝা গেল না—মনে হয়, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মত হবে; পঁয়তাল্লিশও হতে পারে। সারাদিন শুয়ে-বসে থাকে, পুরনো বইয়ের দোকানদার; কিংবা লটারির ক্যানভাসারও হতে পারে। রাজমিস্ত্রী, তালামিস্ত্রী, বা ছাতা মিস্ত্রীরাও শীতকালে ওরকম কোট গায়ে দেয়। লোকটাকে একজন তাল... না, ছাতা সারাইওয়ালাই মনে হয়েছে আমার।’

‘ওকে ভেতরে আসতে বলো, ক্যাপ্টেন,’ সিগারটা জেলে ধোঁয়া ছাড়লেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসির সূক্ষ্ম একটা রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, স্মার্ট ভঙ্গিতে হাতের ইশারায় ডাক দিয়ে বলল, ‘এই যে, মিয়া! এদিকে আছেন। বরো সাবে ডাকে।’

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অফিসে ঢুকল জীর্ণ কোট পরা স্থূলদেহী লোকটি, থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়াল দরজার কাছে। বারবার এদিক-ওদিক তাকানো দেখে মনে হলো, বিশাল ঘরটাতে ঢুকতে

ভয়ই পাচ্ছে বেচার।

সোহানা নরম সুরে বলল, ‘ক্যাপ্টেন, তুমি কি একবারও ভেবেছ, এই লোকটা বিদেশি কোনও স্পাই হতে পারে? এমন কি হতে পারে না, আমাদেরকে খুন করতেই পাঠানো হয়েছে একে?’

হাসি-হাসি হয়ে গেল ক্যাপ্টেন মাহমুদের চেহারা, তবে হাসল না। ‘এই লোক স্পাই?’ স্পষ্ট অবিশ্বাস ঝরল তার কণ্ঠে। ‘হতে পারে না, আপা। এরকম খোঁড়া আর বিদঘুটে মোটা একটা লোক ইচ্ছে করলেই তো আর স্পাই...’

গম্ভীর হয়ে গেল সোহানা। ‘তবুও ওকে সার্চ করে দেখো কোনও অস্ত্র পাওয়া যায় কি না। এখানে চিফ আছেন, তোমার সাবধান থাকা উচিত নয়? ওর পেটে হয়তো কোনও কুবুদ্ধি আছে।’

কথাটা শুনে লোকটার গোবেচার। চেহারায় স্নান হাসি দেখা দিল।

দক্ষ হাতে নবাগতের কাঁধ থেকে তল্লাসী শুরু করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, চাপড়ে দেখল কোঁচকানো কোট। খলখলে পেটে হাত দিয়েই থমকে গেল হঠাৎ। বড় বড় হয়ে উঠল তার চোখ। কোট সরিয়ে স্প্রিং হোলস্টার থেকে টেনে বের করে নিল সে নিয়মিত তেল দেওয়া একটা .৩৮ ওয়ালথার পিপি পিস্তল।

এবার আরও অনেক যত্ন ও খানিকটা সমীহের সঙ্গে ছাতা মিস্ত্রীকে সার্চ করল সে। বিশেষ মনোযোগ দিল শার্টের কনুই ও প্যান্টের পায়। দুটোর দিকে। কাজটা সেরে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে তাকাল সলিলের দিকে। ‘আর কিছু নেই, স্যার। পকেটে টুকটাকি কিছু খুচরো পয়...’

হঠাৎ চমকে থেমে গেল সে। শক্তিশালী একটা ইস্পাত-দৃঢ় বাহু তার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। ছাতা সারাইওয়ালার আরেক হাতে একটা ফোল্ডিং নাইফ। ওটা এখন আর ফোল্ড করা নেই।

সাড়ে চার ইঞ্চি ক্ষুরধার বাঁকানো ফলা স্পর্শ করেছে শিকারের কণ্ঠনালী। কানের কাছে লোকটার ভরাট, পুরুষালী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ক্যাপ্টেন মাহমুদ: ‘খবরদার! একচুল নড়লেই দু’ফাঁক করে দেব গলাটা!’

মেজর জেনারেল রাহাত খানের দিকে তাকাল সলিল, সোহানা ও রূপা। সোহেল আহমেদও চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

দরজার কাছে মূর্তির মত স্থির দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন ও তার পিছনের ছাতা মিস্ত্রির দিক থেকে চোখ ফেরালেন রাহাত খান, গমগম করে উঠল তাঁর কণ্ঠ: ‘ওকে ছেড়ে দাও, রানা।’

বজ্র আঁটুনি শিথিল হয়েছে, টের পেল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, কয়েক পা সরে দাঁড়াল। মুখ রক্তশূন্য। এখন বুঝতে পারছে, হাঁদা বনে গেছে সে; আসলে ওই লোকটা ভোঁদাই-মাল সেজে ঠকিয়েছে ওকে, এমনকী তার গোলচে কাঁধ আর বিরাট ওই ভুঁড়িটা পর্যন্ত নকল!

‘কিস্ত... কিস্ত... ছুরিটা কোথেকে...’ এতক্ষণে বাকস্ফূরণ হলো ক্যাপ্টেন মাহমুদের।

‘ওটা আমার মাফলারের ভাঁজে ছিল,’ বলল মাসুদ রানা। ‘গলার সামনের দিকে মাফলারের তলায় রাখার জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি।’

‘তিরিশ ফুট দূর থেকে তোমার যে-কোনও চোখে ওটা বিধিয়ে দিতে পারবে রানা,’ গর্বের সঙ্গে বললেন রাহাত খান, ‘একশোবারে একশোবারই।’ কথাটা বলে ফেলেই বুঝলেন, রানার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন, কটমট করে তাকালেন তিনি ওর দিকে। ‘হাঁ করে কী শুনছ, আর কী কী আছে দেখাও ওকে।’

নির্দেশ পালন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। ওর মাফলারের তলা থেকে বের হলো সরু একপ্রস্থ তার। ওটার দু’প্রান্তে দুটো রিং। ‘শ্বাস আটকে মারার জন্যে। কীভাবে, দেখবে? এই যে...’

লাফ দিয়ে সরে গেল মাহমুদ তিন হাত তফাতে, সজোরে মাথা নাড়ল। দেখবে না। কীভাবে এটা দিয়ে খুন করা হয়, দেখেছে ও গডফাদার ছায়াছবিতে লুকা ব্রাসির খুনের দৃশ্যে। বাপরে-বাপ!

এবার নির্বিকার চেহারায় জানাল রানা। ‘আমার হাত-ঘাড়টা টাইম তো দেয়ই, প্রয়োজনে একে টাইম-বোমা হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। বেল্টের বাকলের ভেতরে গোপন কুঠুরিতে আছে যে-কোনও সাধারণ তালা খোলার জন্যে লক-পিক। জুতোর সোলের ভেতরে রয়েছে মিনি ট্রান্সমিটার আর একটা চার ভাঁজ করা স্টিলেটো ...ব্যস, আপাতত এ-ই।’

‘বিরাট বড় একটা ভুল করে ফেলেছ তুমি, ক্যাপ্টেন,’ মাপা স্বরে বলল সলিল। ‘এরকম ভুল করলে তো বেঘোরে মারা পড়বে তুমি শত্রুর হাতে।’

ভগ্নহৃদয় ক্যাপ্টেন মাহমুদ ফ্যাকাসে চেহারায় তাকাল পরীক্ষকদের দিকে। কোনও মন্তব্য করল না কেউ, নম্বর টুকছে যার-যার নোট প্যাডে।

‘বিসিআই-এ তুমি নিয়োগ পাবে কি না সেটা অনেকখানিই নির্ভর করে তোমার সপ্রতিভ, সদাসতর্ক ও সদাপ্রস্তুত থাকার ওপর,’ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে টাইপ করা কাগজে অন্যান্য পরীক্ষায় ক্যাপ্টেনের ফলাফল দেখলেন মেজর জেনারেল। ‘আর সব বিষয়ে তো খারাপ করোনি দেখছি। যাক, বাকিটুকু নির্ভর করবে পরীক্ষকদের নম্বরের ওপর।’

সিগারটা অ্যাশট্রেতে টিপে নেভালেন রাহাত খান, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ওয়েল, তোমাদের দেয়া নম্বরগুলো বন্ধ খামে করে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো।’ দরজার কাছে চলে গিয়ে জানালেন, ‘রানা, ওকে নিয়ে পনেরো মিনিট পর আমার অফিসে এসো।’ লাউঞ্জে বেরিয়ে গেলেন তিনি কনফারেন্স হল থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস বইল কনফারেন্স রুমে। রানার ভুঁড়িতে কনুইয়ের

একটা গুঁতো লাগিয়ে দিয়ে, পাল্টা আক্রমণ আসবার আগেই লাফ দিয়ে কেটে পড়ল সোহেল।

বের হলো অন্যরাও। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে মেজর জেনারেলের পিছু নিল রানা, তারপর তারেক মাহমুদকে নিয়ে সটকে পড়ল করিডরের প্রথম বাঁকে।

তেরো মিনিট পর রাহাত খানের আউটার-অফিসে হাজির হয়ে গেল ওরা, পেট ও কাঁধের প্যাডিং খুলে আবার আগের সূঠাম দেহ ফিরে পেয়েছে রানা।

রানাকে দেখে সুন্দর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল ইলোরার। ব্যাটা কখন কী করে বসে, ঠিক আছে? কঙ্কন-রিনিঝিনি স্বরে বলল, ‘খবরদার, এখানে দাঁড়াবে না! স্যর এক্ষুনি তোমাদের ভেতরে যেতে বলেছেন।’

ইলোরাকে একফালি মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে দরজায় দু’বার নক করে বিসিআই চিফের অফিসে ঢুকল রানা, ওর পিছনে তারেক মাহমুদ।

‘টেক সিটস্,’ সিগার তাক করে টেবিলের উল্টোপাশে চেয়ারদুটো দেখালেন রাহাত খান। তাঁর সামনে টেবিলের উপর দেখা যাচ্ছে পরীক্ষকদের রিপোর্ট।

পাশাপাশি বসল ওরা। বুকের খাঁচায় লাফাচ্ছে ক্যাপ্টেনের হুৎপিণ্ড।

কাঁচাপাকা ভুরুর নীচ দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে সরাসরি তাকালেন বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

‘যদি মনে করো ট্রেইনিং মাত্র শুরু হয়েছে তোমার, আরও বহু কিছু শিখবার আছে, তা হলে হয়তো কোনও অ্যাসাইনমেন্টে মাসুদ রানার সঙ্গে শিক্ষানবীশ হিসেবে থাকতে পারবে তুমি। এটাও পরীক্ষার একটা অংশ। সুযোগটা নিতে চাও?’

‘আমি একেবারেই নতুন, স্যর,’ হড়বড় করে বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, একটা সুযোগ পেতে পারে জেনে কৃতজ্ঞ, ‘মাত্র শিখতে

শুরু করেছি। কোনও অ্যাসাইনমেন্টে যাবার সুযোগ পেলে সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে করব।’

‘আমিও,’ মনে মনে বলল রানা। ‘নইলে বাঘা বুড়োটা অ্যাসাইনমেন্টের সামান্য একটু আভাস দিতেই এমন উত্তেজনা অনুভব করছি কেন!’

রিমোট তুলে কয়েকটা সুইচ টিপলেন মেজর জেনারেল, একপাশে সরে গেল দেয়ালের খানিকটা অংশ। ওখানে বড় একটা স্ক্রিন, তাতে ফুটে আছে মানচিত্র। কোন্ দেশের ম্যাপ, আকৃতি দেখে চিনতে পারল না রানা।

‘বান্ধেরা লেক, আর আশপাশের দুই বর্গমাইল এলাকা,’ রানার না-করা প্রশ্নের জবাবেই যেন বললেন রাহাত খান। ‘আসামের সীমান্ত থেকে বেশ কয়েক মাইল ভেতরে, বড়সড় একটা পাহাড়ি হ্রদ বান্ধেরা। চারপাশে ঘন জঙ্গল। আসাম লিবারেশন আর্মির মুভমেন্ট থাকায় এলাকাটা প্রায় জনশূন্য। এয়ারপোর্ট তো নেই-ই, হ্রদে পৌঁছানোর জন্যে কোনও পাকা সড়কপথও নেই। যেতে হবে প্লেনে। সি-প্লেন নামতে পারবে হ্রদে। বান্ধেরার পূর্ব তীরে তাঁবু ফেলেছেন এক পাকিস্তানি ফিযিসিস্ট, ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ। ওখানেই ওঁর সঙ্গে দেখা করবে তোমরা।’

‘ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ!’ বলল বিস্মিত রানা, ‘ইনিই কি সেই বিশ্ববিখ্যাত পাকিস্তানি বিজ্ঞানী, স্যর?’

‘হ্যাঁ। দুনিয়ার সেরা দশজনের একজন। আলট্রা-সাইন্ড ওয়েপন, অ্যাটম ফিউয়িং আর অ্যারোনটিক্স ফিল্ডে মস্তবড় অবদান আছে তাঁর। মাস চারেক আগে সরকারী টিভি চ্যানেলে পাকিস্তানে মাথা চাড়া দেয়া ইসলামি জঙ্গিবাদ ও ফ্যানাটিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য দিয়ে মহা বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সেসময় কয়েকটা ডেইলি পেপারেও তাঁর সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল। ধর্মাত্মতার বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য দিয়ে

আলোচিত-সমালোচিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি গোটা পাকিস্তানে। প্রথমে প্রাণনাশের হুমকি দিল তাঁকে কয়েকটা জঙ্গি সংগঠন। এর পরপরই হামলা হলো তাঁর বাড়ি ও গাড়িতে। এমনকী আত্মঘাতী বোমাসহ ধরা পড়ল তিনজন তাঁর ল্যাবের আশপাশ থেকে। নানান ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত পারভেজ মুশাররফ সরকার তাঁকে প্রোটেকশন দিতে পারবে না বুঝে পালালেন তিনি পাকিস্তান থেকে, বিশ্বস্ত এক দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ভারতে। তারপর থেকে ভারতের বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্সের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

‘কেন?’ মাহমুদের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

ঈ কুঁচকে ওকে দেখলেন বৃদ্ধ, তবে সহজ ভাবেই বলে চললেন, ‘ওরা যত আদর-খাতির করুক, কিছুতেই ভারতে থাকবেন না তিনি। বহুবার বিবৃতি দিয়েছেন, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেই বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের এই করণ, অপাংক্ত্যে অবস্থা। চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মুক্তমনের মুসলিম তিনি, তাই মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ নেই এমন কোনও মুসলিম দেশে বাস করতে চান। ...বাংলাদেশকেই আসলে তাঁর প্রথম পছন্দ। পড়ে দেখো...’

একটা ফাইল এগিয়ে দিলেন রাহাত খান। ওটাতে ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজের পক্ষে-বিপক্ষে প্রকাশিত পাকিস্তানী বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকার কাটিং রয়েছে।

রানা ও তারেক মাহমুদ ওগুলো পড়ে মুখ তোলার পর রাহাত খান আবার শুরু করলেন, ‘কয়েকদিন আগে আমাদের স্পেশাল বিসিআই ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করেছেন উনি।’

‘কীভাবে?’ তাজ্জব হয়ে গেল রানা। ‘আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি উনি কোথায় পেলেন, স্যর?’

‘আমাদের লোকই দিয়েছে, ইসলামাবাদে,’ আরও গম্ভীর হয়ে গেল রাহাত খানের চেহারা। রানার চোখে প্রশ্ন দেখে

জবাবটা নিজেই দিলেন, ‘আমার অনুমতি নিয়েই। ডক্টর ইমতিয়াজের সঙ্গে যোগাযোগের পরদিনই আততায়ীর ভয়ে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয় সে। তার পরের রাতে কোনও ট্রেস না রেখে উধাও হয়ে যান বিজ্ঞানী। হৈ-চৈ পড়ে যায় পাকিস্তান সরকারের ওপর মহলে। খবরটা লিকআউট হতে না দিয়ে খুঁজতে শুরু করে তাঁকে পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স। খুঁজতে শুরু করে ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসও। ...দেড়মাস পর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন উনি তাঁর গোপন আস্তানা থেকে। শুধু আমরাই জানি ওঁর লোকেশন। যা আভাস দিয়েছেন, তার সার-সংক্ষেপ হলো: নিজের যুগান্তকারী একটা আবিষ্কার তুলে দিতে চান তিনি বাংলাদেশের হাতে, তার বদলে চান এখানে নিরাপদ রাজনৈতিক আশ্রয়।’

‘জিনিসটা কী, স্যর?’ সামনে ঝুঁকে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ।

বিরক্ত হলেও সেটা প্রকাশ করলেন না মেজর জেনারেল, গম্ভীর চেহারায় বললেন, ‘ওটার নাম দিয়েছেন তিনি সনিক মিরাক্‌ল। ওঁর বর্ণনা থেকে আন্দাজ করছি, জিনিসটার আকৃতি সাধারণ কোনও হ্যান্ডিং রাইফেলের মত। সরু রেখায় আলট্রাসনিক বিম ছুঁড়ে দেয় ওটা—অনেকটা কনসেন্ট্রেটেড লেয়ার বিমের মত। ভদ্রলোক জোর দিয়ে বলছেন, কোনকিছুর দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে সেটার অ্যাটমিক স্ট্রাকচার—এ চরম বিঘ্ন ঘটায় ওই শব্দতরঙ্গ। ফলাফল: বোমা যেমন করে ফাটে, ঠিক তেমনি করে বিস্ফোরিত হয় টার্গেট। মাইন্ড ইট, অস্ত্রটার রেঞ্জ পাঁচ হাজার মিটার!’

‘বাপরে! শুনে বিশ্বাস হতে চায় না!’ বিড়বিড় করে বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ।

‘আমাদের বিজ্ঞানীরাও একই কথা বলছেন,’ সিগার ধরালেন রাহাত খান। ‘তবে ওরকম কোনও অস্ত্র তৈরি করা একেবারে

অসম্ভব বলেও মনে করছেন না তাঁরা।’ রানার দিকে তাকালেন তিনি। ‘তোমাকে দেখতে হবে সনিক মিরাকল অস্ত্র হিসেবে কতখানি কার্যকর। যদি সত্যিই কাজের জিনিস হয়, আর ওটার ধবংসক্ষমতায় তুমি সন্তুষ্ট হও, তা হলে সনিক মিরাকলের প্রোটোটাইপ আর নকশার বদলে ডক্টরকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আশ্বাস দেবে তুমি। উনি যদি অন্য কোনও শর্ত দেন, বিসিআইয়ের টপ সিক্রেট টেন ফ্রিকোয়েন্সির যে-কোনও একটায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।’

‘জী, স্যর।’

পাশ থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুললেন রাহাত খান, ফাইলে চোখ নামিয়ে বললেন, ‘আগামীকাল সকালে রওনা হচ্ছে তোমরা কুমিল্লা থেকে। ট্র্যাভেলিং অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর ডিটেইলস্‌ জেনে নিয়ো সোহেলের কাছ থেকে। ...এবার তোমরা এসো।’

রানার পাশে হেঁটে বের হলো তারেক মাহমুদ, পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর লজ্জিত চেহারায়ে স্বীকার করল, ‘একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন, মাসুদ ভাই।’

‘আরে, ও কিছু না! বিসিআইতে এসে প্রথম প্রথম আমরাও কম বোকা বিনি, সান্ত্বনার সুরে বলল রানা। ‘চলো, ক্যান্টিনে যাওয়া যাক। চা খাব। জাঁদরেল বুড়োর ভয়ে গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ!’

ওর বলবার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। অনেক সহজ বোধ করছে ও রানার আন্তরিক ব্যবহারে।

দুই

চব্বিশ ঘণ্টা পর সি-প্লেনের পাইলট, লেফটেন্যান্ট নেভি, আলতাফ নাদভীর পাশে ককপিটে বসে বিভিন্ন দোয়া-দরুদ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে শুরু করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। ভারত সীমান্ত কাছাকাছি আসতেই রেইডার ফাঁকি দেবার জন্য সি-প্লেনটাকে একেবারে নীচে নামিয়ে এনেছে লেফটেন্যান্ট নাদভী, তারপর ঢুকে পড়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডে। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে তাকালে মনে হয়, এই বুঝি সবুজ পাহাড়গুলো গুঁতো মারবে প্লেনের পেটে, দূরের পাহাড়সারি দ্রুত ধেয়ে আসছে ওদের বাধা দিতে। একটার পর একটা সবুজ দেয়াল উপকে ছুটে চলেছে খুদে বিমান, মাঝে মাঝে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ছে দুই পাহাড়ের মাঝখানে, উড়ে চলেছে পাহাড়ের গা ঘেষে। বুকে আশঙ্কা জাগে, একটা দেয়াল হয়তো উপকালে পারবে না শেষপর্যন্ত, কিংবা এই বুঝি পাশ থেকে গুঁতো খাবে পাহাড়ের গায়ে।

পিছনের সিটে বসে মাসুদ ভাইকে নিশ্চিন্তে খবরের কাগজ পড়তে দেখে ঈর্ষা হলো মাহমুদের। স্থির করল, যত কঠোর ট্রেনিংই নিতে হোক, ওরকম খাঁটি টাইটেনিয়ামের মত পোক্ত স্নায়ু চাই ওরও।

আধঘণ্টা পর উইন্ডস্ক্রিনে টোকা দিল লেফটেন্যান্ট নাদভী, ইঞ্জিনের গর্জনের উপর দিয়ে চোঁচিয়ে বলল, ‘ওই দেখুন বাম্বেরা লেক। আমরা যেখানে নামব, সেখান থেকে রুঁদেভু পয়েন্ট কয়েকশো গজের বেশি নয়।’

শান্ত হৃদের নীল জলরাশির বুকে রাজহংসের মত রাজসিক ভঙ্গিতে নামল নেভির সি-প্লেন। পূব তীরের একশো গজ দূরে ছোট্ট বিমানটাকে থামাল আলতাফ, বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। সিটে হেলান দিয়ে বলল, ‘আর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছি না, স্যর। তীর ঘেষে অসংখ্য ডুবো-পাথর রয়েছে।’

এবড়োখেবড়ো উঁচ-নিচু দাঁতের মতো চূড়াগুলো দূর থেকে ঘিরে রেখেছে সবুজ ঘাসে ছাওয়া অগভীর বাটির মতো জায়গাটাকে। পিরিচের বুকের মাঝখানে যেন বসে আছে গাঢ় নীল পানির শান্ত হ্রদ। হ্রদের তীরে পড়ে আছে বড় বড় পাথর। ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে বিশাল সব গাছ, বাঁশঝাড়। কোথাও কোথাও হ্রদের তীরে দেয়াল তৈরি করেছে ঘন সবুজ গাছের গহীন জঙ্গল।

আলতাফ নাদ্ভীর কথা শেষ হতে না হতে ছোট একটা নৌকা এগিয়ে আসতে দেখল রানা। তীরবর্তী জঙ্গলে নিশ্চয়ই সরু কোনও খাল আছে, সেটা থেকে বেরিয়ে সোজা সি-প্লেনের দিকে আসছে নৌকাটা। একজন মাত্র লোক বৈঠা বাইছে। তবে তাকে মানব না বলে দানব বললে একটুও মিথ্যে বলা হবে না। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। নৌকা বাইতে গিয়ে হাতের পেশিগুলো কিলবিল করছে।

মিনিট পাঁচেক পর সি-প্লেনের স্টারবোর্ড পনটনের গায়ে ঢপ করে ভোঁতা একটা শব্দ হলো। পাশের ছোট জানালা দিয়ে তাকাল রানা, মুখ উঁচু করে ওর দিকেই চেয়ে আছে খাকি পোশাক পরা পুরুষ গৌফওয়ালা দৈত্যটা। লম্বায় ওর চেয়ে একমাথা বেশি হবে লোকটা, চওড়ায় দেড় কি দুইগুণ।

তারেকের সামনে দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্লেনের দরজা খুলল রানা, গলা বের করে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি ডক্টর মমতাজের কাছে নিয়ে যাবেন আমাদের?’

‘হাঁ,’ উদ্রুতে জবাব দিল লোকটা। পরমুহূর্তে ভুল সংশোধন করল রানার, ‘আরে, ন্যহি, উনকা নাম মামতাজ ন্যহি, ডাক্তার ইমতিয়াজ। হাম ডাক্তার সাহাবকা সেরকেটারি-কাম-বডিগার্ড হুঁ। আইয়ে, ডাক্তার সাহাব আপ দোনোকে লিয়ে বহোত পেরেশানিসে ইন্তেয়ার ক্যর রাহে হুঁয়।’

দু’মিনিট পর রানা ও তারেক মাহমুদকে নিয়ে তীরের দিকে

রওনা হয়ে গেল সে। পিছনে সি-প্লেনের ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল ওরা। রওনা হয়ে গেল আলতাফ, ভিনদেশি রেইডার ফাঁকি দিয়ে ফিরে যাবে স্বদেশে।

রানার ধারণাই ঠিক, জঙ্গলে ঢুকেছে সরু একটা খাল, দুই তীরে উঁচু শালগাছ ও বাঁশঝাড়ের ঘন সারি। খাল না বলে ওটাকে প্রশস্ত নালাও বলা যায়। কিছুটা এগিয়ে বামদিকের পাড়ে কাঁচাহাতে তৈরি করা কাঠের নড়বড়ে ডক দেখতে পেল ওরা। পানির উপর সামান্য এগিয়ে আছে ওটা। শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন নীল স্ট্রাইপড সুট পরা এক মাঝবয়সী সুদর্শন ভদ্রলোক। রানা ও মাহমুদ ডকে নামতেই চোস্ত ইংরেজিতে বললেন তিনি, ‘খুব খুশি হয়েছি, আপনারা এসেছেন। গাফফার খান আপনারদের তাঁবুটা দেখিয়ে দেবে। ওখানেই বিশ্রাম নেবেন আপনারা আগামী তিন-চারটে দিন।’

‘এখানে আসতে কোনও খাটনি হয়নি আমাদের, তাই বিশ্রামের কোনও দরকার নেই, ডক্টর ইমতিয়াজ,’ পরিচয়-পর্ব সেরে ভদ্রলোকের বাড়ানো হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল রানা, ‘বরং আপনার সনিক মিরাকলটা দেখতে পেলে খুশি হব।’

‘পরেও দেখতে পারবেন ওটা,’ ভদ্রতা করে হাসলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ। ‘বিশ্রাম নিন, শীতের আসামের অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি দেখুন, যত খুশি মাছ ধরুন লেকে, সাঁতার কাটুন।’ রানা আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছে বুঝে এবার বললেন, ‘আসলে অস্ত্রটার দু-একটা যন্ত্রাংশ ঠিকমত কাজ করছে না, মিস্টার রানা। ওটা মেরামত করার আগে কোনও ডেমনস্ট্রেশন দেখানো সম্ভব নয়।’

‘পার্টসগুলোর নাম বলুন, রেডিও করে দেখি আমরা আনিয়ে নিতে পারি কি না,’ আগ্রহের সঙ্গে বলল রানা।

দুগুণিত চেহারায় মাথা নাড়লেন ডক্টর। ‘আসলে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। সাধারণ অস্ত্রে যেসব পার্টস থাকে, সেগুলো

দিয়ে তৈরি করিনি আমি সনিক মিরাকল। মিরাকলের প্রতিটা অংশ আমার নিজের হাতে বানানো। বাংলাদেশ সরকার যদি আমার তৈরি অস্ত্রটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তা হলে ওটার ম্যাস প্রোডাকশন চাইতেই পারে। সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনও আধুনিক ল্যাবোরেটরিতে কাজ করবার সুযোগ দিতে হবে আমাকে, তা নইলে জটিল ইলেকট্রনিক সার্কিট আর সূক্ষ্ম পার্টসগুলো তৈরি করা অসম্ভব। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার রানা, আশা করছি আমার অপরিহার্যতাই এনে দেবে আমাকে কাজিফত নিরাপত্তা।’

মূল প্রসঙ্গে ফিরে গেল রানা, ‘পার্টস মেরামত করতে কতক্ষণ লাগবে আপনার, ডক্টর?’

‘দুই... বড়জোর তিনদিন।’ ইতস্তত করলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ। ‘আমার অপারগতা ক্ষমা করবেন, মিস্টার মাসুদ রানা।’ হাতের ইশারা করলেন বিজ্ঞানী। ‘আসুন আপনারা, তাঁবুতে চলুন।’

পথ দেখাল দৈত্য, ঘন বাঁশঝাড় ও শালগাছের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল দ্রুত। বাঁশগাছগুলোতে ফুল আসেনি এখনও। রানা শুনেছে, পঞ্চাশ বছর পরপর নাকি ফুল আসে ওগুলোতে, ওই সময় দেখা দেয় লক্ষ লক্ষ হুঁদুর, সমস্ত ফসল খেয়ে সাফ করে দেয় ওরা। জঙ্গল মরে যায় তখন, এবং শুরু হয় পাহাড়ি দুর্ভিক্ষ। আগামী দু’এক বছরের মধ্যেই আসছে বাঁশগাছে ফুল ধরবার সেই ভয়ঙ্কর সময়। মিজোরামের দিকে দুর্বিষহ দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ভারত সরকার, রানা জানে। বাংলাদেশ সরকার এ-ব্যাপারে এখনও উদাসীন।

আকাশ-ছেঁয়া কয়েকটা তেঁতুল গাছের নীচে ফাঁকা জায়গায় তাঁবু দুটো দেখতে পেল ওরা মিনিট বিশেক হাঁটবার পর। কথায় কথায় বিজ্ঞানী জানালেন, বড় তাঁবুটা ব্যবহার করছেন তিনি তাঁর ল্যাবোরেটরি ও কোয়ার্টার হিসেবে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চৌকো আকৃতির আরবী তাঁবুটাতে ঢুকে পড়লেন তিনি। গাফফার খানের সঙ্গে ছোট্টায়ে গিয়ে ঢুকল রানা ও মাহমুদ। মেঝের দু’দিকে ফেলা দুটো তেরপল দেখাল খান, বিশ্রী উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, ‘আপনারা শোবেন ওখানে।’

পিঠ থেকে হ্যাভারস্যাক নামিয়ে বামপাশের তেরপলের উপর রাখল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, মিস্টার খান, এখানে আসবার আগে বা পরে ডক্টর ইমতিয়াজের কোনওরকম বিপদ হয়েছিল?’

সরাসরি রানার চোখে অন্তর্ভেদী খয়েরী চোখদুটো রাখল দেহরক্ষী। ‘কী বলতে চাইছেন বুঝলাম না, জনাব মাসুদ রানা।’

‘বলতে চাইছি, ডক্টর ইমতিয়াজ তো তাঁর দেশের, মানে পাকিস্তানের, নামকরা একজন বিজ্ঞানী। দেশ ছেড়ে তাঁর পালানোটা নিশ্চয়ই সহজভাবে নেয়নি পাকিস্তান সরকার? এমন কি হতে পারে, তারা ডক্টর ইমতিয়াজের খোঁজে কাউকে বা কোনও দলকে পাঠিয়েছে?’

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসল খান। ‘হয়তো পাঠিয়েছে, হামি জানে না। তবে, আপ ইত্মিনান্‌সে রাহিয়ে, দুনিয়ার কোঙ্গিভি জানে না হামলোগ কাঁহা হয়।’

‘তারপরও, যদি কেউ টের পেয়ে যায়?’

‘কুছ ন্যহি হোগা। হামার নযর বাচাকে ক্যাম্পকে নযদিগ আসতে পারবে না কোঙ্গি দুশমন,’ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল খান। শোন্ডার হোলস্টার থেকে একটা পাকিস্তানী .৩২ মিশ্রী খান রিভলভার বের করল সে, রানা ও মাহমুদকে ইশারা করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। ‘হাম হয় ডাক্টার সাহাবকা পাহারাদার। তার জান্যে হামার জান কবুল। আসুক দেখি কেউ। জান লিয়ে ওয়াপস যাতে পারবে না। ...দেখিয়ে উধার।’ তিরিশ গজ দূরে একটা ঝড়ে ওপড়ানো গাছ দেখাল সে

রিভলভারের নল দিয়ে। গাছের কাণ্ডটার ব্যাস একফুটের বেশি হবে না। ‘খেয়াল দিজিয়ে। উধার এক ছোট গিটু দেখা যায়? ও-ই উধার?’

গিঁঠের উপর রানার দৃষ্টি স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় রিভলভারটা তুলল খান, কজির নীচে বাম হাতের ঠেকা দিয়ে এক সেকেন্ড তাক করেই গুলি করল পরপর দু’বার। গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর অস্ত্রটা নামিয়ে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, ‘দুইটা গুলির একটাও যদি ওই গিটু’র এক ইঞ্চি’সে যিয়াদা দূরে লাগে, আপনা কান কাটকে কুত্তাকো খিলাব হামি।’

‘দারুণ শুটিং করেছেন তো!’ আন্তরিক প্রশংসা ঝরল তারেক মাহমুদের কণ্ঠে, ‘একেবারে টার্গেটেই লেগেছে আপনার একটা গুলি।’

‘ঠিক,’ বলল রানা। ‘সত্যিই দারুণ হাত আপনার।’

‘এবার আমি দেখি তো চেষ্টা করে,’ শোল্ডার হোলস্টার থেকে বিসিআই ইস্যু ওয়ালথারটা বের করল মাহমুদ, পাশ ফিরে পিস্তল তাক করল কাণ্ডের ওই গিঁঠের দিকে, তারপর হালকা ভাবে স্পর্শ করল হেয়ার-ট্রিগার। কড়াৎ শব্দে লাফিয়ে উঠল .৩৮ ওয়ালথার পিপি। মনটা খারাপ হয়ে গেল বেচারার, গাছের গায়ে তৃতীয় গুলির চিহ্ন নেই কোথাও। সেফটি-ক্যাচ তুলে দিয়ে অস্ত্রটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল মাহমুদ।

রানা বলল, ‘চলুন, দেখা যাক কার গুলি কোথায় লাগল।’

খানের গুলির তৈরি ফুটো আর ওই গিঁঠটাকে এক টাকার একটা কয়েন দিয়ে ঢেকে দেয়া যাবে। একটা গুলি তো সরাসরি গিঁঠের মাঝখানে লেগেছে। দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে প্রথম গুলির সিকি ইঞ্চি দূরে।

‘অণ্ডর দেখনা কয়া হয়? ইয়াহাঁসেই দিখাই যা র্যহা, আপ মিস কিয়া,’ টিটকারির সুরে মাহমুদকে বলল গাফফার।

‘বোঙ্গালি বাবু হয় তো, বান্দুক-পিস্তল হাথমে উঠানা আপলোগোঁকা কাম ন্যহি।’

‘গাছের ওপাশে গিয়ে ওদিকটা একটু দেখুন,’ পরামর্শ দিল গম্ভীর রানা।

‘কয়া হোগা দেখেনসে?’ গোঁফে তা দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসল গাফফার খান। ‘আপ বোঙ্গালিলোগ টার্গেটমে গোলি লাগানেকা লায়েকহি ন্যহি হয়! বোঙ্গালি কাভি হাথিয়ার পাকাড়না সিখা?’ হেসে উঠে ক্যাপ্টেন মাহমুদকে দেখল সে আপাদমস্তক।

রানার মনে হলো, সেন্টে এক চড় মেরে ফাটিয়ে দেয় হামবাগ লোকটার বাম কান। বলতে ইচ্ছে হলো, তা হলে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুকুতের ভয়ে ইঁদুরের মত গর্তে লুকিয়েছিল কেন তোরা? ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলি কাদের ভয়ে? কিন্তু মেজাজটা সামলে নিল ও। মাথা গরম করে মারামারিতে জড়িয়ে পড়তে এখানে পাঠানো হয়নি ওকে।

কিন্তু বাঙালিদের প্রতি ছুঁড়ে দেয়া পাকিস্তানী দানবের অপমান আর সহ্য হলো না তরুণ ক্যাপ্টেন তারেকের, রানা ঠেকাবার আগেই ‘বেত্তমিজ! বেল্লিক! ব্যাটা বদমাশের ছাও!’ বলে হুক্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে পৌনে সাতফুট গাফফারের উপর, প্রতিপক্ষকে ক্ষণিকের জন্য অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে দুইহাতে ধূপধাপ চার-পাঁচটা ঘুসি বসিয়ে দিল তার বুকে আর চোয়ালে।

ঘুসির ধাক্কায় কয়েক পা পিছিয়ে থমকে দাঁড়াল গাফফার, তারপর ভালুকের মত দীর্ঘ দু’হাতের মুঠো পাকাল পাঁচটা ঘুসি ছুঁড়তে।

প্রতিপক্ষ প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখে তার দিকে সোৎসাহে এগোল তরুণ ক্যাপ্টেন; দেড়গুণ আকারের শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে না বিন্দুমাত্রও।

মাহমুদকে থামাতে গিয়েও থামাল না রানা। দেখাই যাক না, এই দৈত্যের বিরুদ্ধে আনআর্মড কমব্যাক্ট কতটা কাজে লাগাতে পারে মাহমুদ।

ভালুকের মতো হেলেদুলে দু'ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল গাফফার খান, তারপর ডানহাত ঘুরিয়ে কাঁধের জোরে ঘুসি মারল মাহমুদের চোয়াল লক্ষ্য করে। বসে পড়ে ঘুসিটা এড়িয়ে গেল মাহমুদ, দুটো আপারকাট মেরে বিস্মিত খানকে একটু পিছাতে বাধ্য করে কাঁধ দিয়ে গুঁতো বসিয়ে দিল তার পেটে। ওর মনে হলো, পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে কাঁধ। উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে শত্রুর লম্বা হাতের আওতার বাইরে সরে যেতে চেষ্টা করল ও। তারই ফাঁকে পাশ থেকে আবার ঘুসি মারল খানের পাজর লক্ষ্য করে।

মাহমুদের হাতের মুঠিটা এবার খপ্ করে ধরে ফেলল গাফফার খান তার বিশাল থাবায়, তারপর সন্তুষ্টির গর্জন ছেড়ে মোচড় দিল জোরে। তীব্র ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল মাহমুদ, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হলো। বাঁ হাত তুলে শত্রুর কড়ে আঙুল ধরতে গিয়ে বুঝল, আনআর্মড কমব্যাক্টে গাফফার খানও কম দক্ষ নয়। পাশ থেকে এক্ষুনি ওর ঘাড়ের ওপরে নেমে আসবে লোকটার হাতের তালুর শক্ত কিনারা, প্রচণ্ড আঘাতটা ঠিকমত লাগলে জ্ঞান হারাবে ও। কাঁধে ব্যথা বাড়বে বুঝেও ঝটকা মেরে ডানহাতটা ছুটিয়ে নিতে চেষ্টা করল মাহমুদ, পারল না। তারপরেই দেখতে পেল, ভোজবাজির মত খানের হাতে চলে এসেছে একটা ক্ষুরধার ছোরা। কারাতের কোপ নয়, ওর ঘাড় বরাবর নেমে আসছে গাফফার খানের হাতে ধরা ছোরাটা। হাসছে লোকটা, গলার গভীর থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হচ্ছে, বীভৎস দেখাচ্ছে চেহারা।

মৃত্যু আর কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, বুঝে ফেলল মাহমুদ। কারও সাহায্য চাওয়া বা পাওয়ার আগেই কল্লাটা গড়াগড়ি খাবে

ঘাসের উপর। চোখের কোণ দিয়ে বামপাশে ঝাপসা মত কী যেন দেখল মাহমুদ। পরমুহূর্তে টের পেল, বিদ্যুৎ-বেগে কাছে চলে এসেছে মাসুদ ভাই। গোক্ষুরের ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে রানার ডানহাতটা ধরে ফেলল গাফফার খানের ছুরি ধরা হাতের কবজি, ছুরিটাকে থামিয়ে দিল মাঝপথে। ত্রুন্ধ গর্জন করে উঠল গাফফার খান, বিশ্রী কয়েকটা গালাগালি দিয়ে মাহমুদের হাত ছেড়েই দেরি না করে বামহাতে ঘুসি ছুঁড়ল রানার চোয়াল লক্ষ্য করে।

মাথাটা সামান্য সরিয়ে নিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে ঘুসিটা বেরিয়ে যেতে দিল রানা। ফসকানো ঘুসির বেগে ভারসাম্য হারিয়ে দানবটা ডানদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখেই সুযোগটা নিল ও—এক টানে কবজিধরা হাতটা ওর মাথার উপর দিয়ে নিয়ে এল নিজের ডানপাশে। রানার সামনে ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে এখন দানব। ডানহাতের কবজি রানার মুঠি থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, একইসঙ্গে বাম কনুইয়ের আঘাতে রানার পাজরের চার-পাঁচটা হাড় ভেঙে দেয়ার জন্য উপরে তুলছে হাতটা। থাবা দিল রানা খানের বাবরি লক্ষ্য করে, আচমকা হ্যাঁচকা টান খেয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল দানবের দৃষ্টি। পরমুহূর্তে পিছনদিকে হেলে পড়ে যেতে শুরু করল রানা—একটা পা তুলে দিয়েছে লোকটার কোমরে। ওর সঙ্গে পিছনে হেলে পড়ছে গাফফার খানও। নিজের কোমর মাটিতে ঠেকতেই দ্বিতীয় পা-টাও দৈত্যের চওড়া কোমরে তুলল রানা; তারপর একইসঙ্গে ছুঁড়ল দুই পা আসমানের দিকে। এবার নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিল লোকটার ছুরিধরা কবজি।

রানার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল চারমণী বস্তা, শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ধড়াস করে পড়ল উপুড় হয়ে, কপাল ঠুকে গেল শক্ত মাটিতে। উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, অবাক হয়ে দেখল, রক্তাক্ত নাক-মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে দানবও। মুখ দিয়ে পাঞ্জাবী গালাগালির তুফান বের হচ্ছে। চোখ নামিয়ে একবার দেখল

ছোরা ছুটে গেছে তার হাত থেকে, তারপর নিচু একটা গর্জন ছেড়ে পাগলা ঘাঁড়ের মতো আবার তেড়ে এলো সে রানার দিকে। ধারণা করেছিল পালাবে রানা, কিন্তু লোকটাকে অনড় দেখে চরম বিস্মিত হলো। আওতার মধ্যে পৌঁছে যেতেই লাফিয়ে শূন্যে উঠল রানা, প্রাণপণ শক্তিতে ফ্লাইং কিক ঝেড়ে দিল ওর নাক-মুখ সই করে। কড়মড় করে আওয়াজ হলো কয়েকটা দাঁত ভাঙার। চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা এবার। পড়েই বের করল ওর রিভলভার।

তীক্ষ্ণকণ্ঠের আদেশ ভেসে এল রানার পিছন থেকে: ‘খান! এক্ষুনি অস্ত্র ফেলো! ওদের হাতের দিকে চেয়ে দেখো, গাধা কোথাকার!’

ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে রানা ও মাহমুদের হাতে দুটো পিস্তল দেখতে পেল গাফফার খান। দুটোই চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

সামনে চলে এলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ। শান্ত স্বরে বললেন, ‘আপনার ফিটনেসের প্রশংসা করতে হয়, মিস্টার রানা। আর মিস্টার মাহমুদের সাহসের। বোঝাই যাচ্ছে দোষটা বদরাগী, বেয়াড়া গাফফারের। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কী নিয়ে লাগল ও আপনাদের সঙ্গে?’ আরও কয়েক পা এগিয়ে গাফফারের রিভলভারটা তুলে নিলেন বৈজ্ঞানিক। ‘তোমার অস্ত্রটা আপাতত সিজ করলাম আমি, খান। আর কোনও গোলমাল চাই না আমি, খবরদার!’

রানা ও মাহমুদও নিজ নিজ অস্ত্র ভরে রাখল হোলস্টারে। থোহু করে তিনটে রক্তাক্ত ভাঙা দাঁত মাটিতে ফেলল খান।

‘গোটা বাঙালির জাত তুলে যা-তা বলছিল গণ্ডারটা,’ নিচু স্বরে বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ বিজ্ঞানীর প্রশ্নের উত্তরে। ‘ছোরা বের করেছিল আমাকে খুন করবে বলে। মাসুদ ভাই বাধা না দিলে আজ আমার লাশ পড়ে যেত এখানে!’

‘পরে ওকে শাসন করব আমি,’ বলে তাঁবুর ভিতর চলে

গেলেন বিজ্ঞানী।

নিজেদের তাঁবুতে ফিরল রানা ও মাহমুদ। যে-কোনও মুহূর্তে আবার আক্রমণ আসতে পারে মনে করে সতর্ক রয়েছে দুজনেই। চুপচাপ বসে থেকে ধকলটা কাটিয়ে উঠল গাফফার খান। মিনিট পাঁচেক পর ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল তাঁবুর খোলা ফ্ল্যাপের সামনে। রানা ও মাহমুদকে শাসিয়ে চাপাকণ্ঠে উর্দুতে বিষোদগার করল কিছুক্ষণ, কিন্তু আগ বাড়িয়ে মারামারি করবার আর কোনও ইচ্ছে দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। মারামারি করাটা মালিকের স্বার্থবিরোধী হয়ে যাবে, বুঝেছে বোধহয়। উঠতে যাচ্ছিল মাহমুদ, কিন্তু কাঁধে রানার হাত পড়তেই বসল আবার। কোনও জবাব দিল না কেউ খানের অশ্রাব্য খিস্তির।

গাফফার খানের কণ্ঠ শুনে আবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ।

বিজ্ঞানীর নির্দেশে রানা ও মাহমুদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে বাধ্য হলো গাফফার খান। অপছন্দের কাজটা সেরে মুখ গোমড়া করে রাখল সে। দৃষ্টির আগুনে ক্যাপ্টেন মাহমুদকে ভস্ম করে দিয়ে অন্তত গুটিঙে যে ওর জয় হয়েছে, সেটা প্রমাণ করে ওই বোঙ্গালি দুজনকে কিছুটা শায়েস্তা করতে চাইল। বাঁকা হেসে বলল, ‘দেখা যাক, গাছের পিছে আপনাদের কালিজার কওন টুকড়া আছে।’

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা ও মাহমুদ।

বিজ্ঞানীও এগিয়ে এলেন। দুটো গুলির দাগ দেখে প্রশংসা করলেন বডিগার্ডের। কিন্তু গাছটা ডিঙিয়ে ওপাশে গিয়েই বিস্ফারিত হয়ে গেল দেহরক্ষীর দু’চোখ। তার রিভলভারের সফট-নোজ গুলি গাছের গুঁড়ির ভিতরে রয়ে গেছে, এটা ভাল করেই জানে সে। কিন্তু দেখা গেল, মাহমুদের ওয়ালখারের হলো-পয়েন্ট বুলেট গুঁড়ি ফুটো করে বেরিয়ে গেছে—বেরোনোর জায়গাটা দিয়ে ঢুকে যাবে তার মুঠো পাকানো হাত! তার যে

গুলিটা সেন্টার থেকে সিকি ইঞ্চি দূরে লেগেছে, ওটার ভিতর দিয়েই গেছে ক্যাপ্টেন মাহমুদের গুলি।

বোঙ্গালি বাবুর দক্ষতা দেখে কালচে হয়ে গেল গাফফার খানের চেহারা।

রানা বলল, ‘ওর বুলেটের গর্তের ভেতর দিয়ে গেছে তোমার গুলি, মাহমুদ। তাই দেখা যাচ্ছিল না।’

‘আপনি এবার দুটো কথা শোনাবেন না বুদ্ধটাকে, মাসুদ ভাই?’ হাসি হাসি চেহারায়ে জিজ্ঞেস করল মাহমুদ।

জবাব না দিয়ে সামান্য একটু মাথা নাড়ল রানা।

এই ঘটনার পর থেকে পরস্পরকে গরম চোখ দেখাল খান ও ক্যাপ্টেন মাহমুদ, কথা বলল না কেউ কারও সঙ্গে, তবে বিরোধটা বাড়লও না আর। বোঙ্গালিদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে গাফফার খান বাহাদুরের বেলুন থেকে বেরিয়ে গেছে বেশ অনেকটা গরম বাতাস।

দুপুরে খাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিল ওরা। তারপর সূর্যটা ঢলে পড়তেই পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার ওপাশে মিলিয়ে যেতে শুরু করল দিনের আলো, প্রশান্ত হ্রদের গাঢ় নীল পানির বুকে এসে পড়ল ভাঙাচোরা কয়েক ফালি সোনালী রোদ। তারপর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল একসময়। কালোর সঙ্গে নীলের মিশেল দেয়া নরম মখমলের চাঁদোয়ার মতো মাথার উপর বুলে থাকল আকাশ, তাতে মিটমিট করল লক্ষ লক্ষ লাল-নীল-হলুদ নক্ষত্র। অল্পক্ষণেই সেগুলোকে স্থান করে দিয়ে পূব-পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়ল চাঁদটা। হ্রদের স্থির পানিতে চতুর্দশী চাঁদের নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখা দিল। তারপর একসময় শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া মৃদু কাঁপন তুলল নিখর পানির বুকে, প্রথমে হেলেদুলে উঠল হাসিখুশি চাঁদমামা, তারপর খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি। হ্রদের বুক ছুঁয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে সরে এলো হাওয়ার শিহরন। একাকী হাওয়া প্রশান্তির আলতো

পরশ বোলাল জঙ্গলের পাতায় পাতায়, ফিসফিস করে বলল কত কী গোপন কথা। রানার মনে হলো, এ যেন পৃথিবীর বুকে অদ্ভুত সুন্দর এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা।

পরবর্তী দুটো দিন কাটল অলস ভাবে। মেঘহীন নীল আকাশে বলমল করল মাঘের সূর্য। ঝিরিঝিরি বাতাস বইল প্রায় সর্বক্ষণ, হ্রদের পানিতে ঢেউ উঠল ছোট ছোট। রানা ও মাহমুদ সময় কাটাল মাছ ধরে, নৌকা নিয়ে বেড়িয়ে, সাঁতার কেটে। ডক্টর ইমতিয়াজ ব্যস্ত থাকলেন তাঁর ল্যাবোরেটরিতে, এলাকার চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াল গাফফার সতর্ক বুলডগের মত।

তৃতীয় দিনটা এলো কেমন যেন বিষণ্ণতা নিয়ে। ভোর থেকেই শুরু হলো জোরালো উত্তরে হাওয়া, সরসর আওয়াজে শিহরন তুলল গাছের পাতায়, শীতল স্পর্শে কাঁপনি ধরিয়ে দিল গায়ে। আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা দেখে মনে হলো বৃষ্টি নামতে পারে। বিকেলের দিকে হাসিমুখে ওদের তাঁবুতে এসে ঢুকলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ, তাঁর সনিক মিরাকল তৈরি, প্রদর্শনীর আগে ল্যাবোরেটরিতে রানা ও মাহমুদকে দেখাতে চান জিনিসটা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে জ্যাকেটের কলার উপরে তুলে দিয়ে গলা পর্যন্ত চেইন টানল রানা, তারপরও পাহাড়ি শীত অনায়াসে কামড় বসাল ওর হাড়ে-মজ্জায়। জগিং করতে করতে ওর পাশে চলল তারেক মাহমুদ।

ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ গোছানো স্বভাবের মানুষ, তাঁর ল্যাবোরেটরীটাও পরিপাটি করে সাজানো। তাঁবুর গোটানো ফ্ল্যাপ পার হয়ে হাতের ডানদিকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম টু-ওয়ে ট্রান্সমিটারটা দেখতে পেল ওরা। বামদিকে মেঝেতে ডক্টরের বিছানা। তাঁবুর মাঝখানে পেটমোটা একটা চুলোয় আগুন জ্বলছে। পিছন-দেয়ালের কাছে ওঅর্ক-বেঞ্চ। ওটার উপর পড়ে থাকা জিনিসটা দৃষ্টি কাড়ল

রানার।

‘এ-ই আমার সনিক মিরাকল, মিস্টার রানা,’ গর্বের সঙ্গে বললেন ডক্টর ইমতিয়াজ।

বিগগেম হান্টিং রাইফেলের চেয়ে আকারে বড় হবে না ওটা, স্টকটাও কোনও একটা রাইফেলেরই, তবে ওখানেই শেষ হয়ে গেছে সব সাদৃশ্য। আড়াই ফুট দীর্ঘ ব্যারেলটার ব্যাস দু’ইঞ্চি, ব্যারেলের শেষে ফিট করা হয়েছে প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর, লক্ষ্যস্থির করবার জন্য ওটার গায়ে একটা খাঁজ। স্টকের নীচে প্রায় কাঁচের মত স্বচ্ছ একটা প্লাস্টিকের বাক্স, ওটার ভিতরে কয়েকটা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ও সরা তামার তারের কয়েল।

‘খেয়াল করলে দেখবেন ওটাতে কোনও ট্রিগার নেই,’ বললেন ডক্টর ইমতিয়াজ। ‘ট্রিগারের কোনও দরকারই নেই আসলে। স্টকের এই বাটন টিপলেই প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিকাল সার্কিটগুলো অ্যাকটিভেটেড হয়।’ অস্ত্রটার দিক থেকে রানার দিকে তাকালেন ডক্টর, বুঝে নিয়েছেন বাংলাদেশি প্রতিনিধি দলের নেতা ও। ‘আপনি হয়তো জানতে চাইবেন সনিক মিরাকল কীভাবে কাজ করে। খুব সহজ ভাষায় বলছি। মিয়া তানসেনের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন—সুরের সাহায্যে কাঁচ ফাটিয়ে দিতে পারতেন তিনি। ঠিকভাবে উপযুক্ত শব্দ-তরঙ্গ পাঠাতে পারলে শুধু কাঁচ কেন, যে-কোনও কঠিন পদার্থকেই চুরমার করে দেয়া সম্ভব। অনেক দূর থেকেও। আলট্রাসনিক তরঙ্গ নিয়ে আমার গবেষণায় আমি দেখেছি, এমন একটি অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব, যেটা দিয়ে ক্যামেরার মত অটো-ডিসট্যান্স সেট করা যাবে, যে-পদার্থকে ডিফিনিটগ্রেট করতে চান, অটোমেটিকালি তার মলিকিউলার ফরমেশন নির্ধারণ এবং রিফ্র্যাকশনের মাধ্যমে নিখুঁত...’

‘ডক্টর,’ খুকখুক করে কাশল রানা, ‘ভুল লোককে বলছেন আপনি এসব। আমার ব্রেনওয়েভের অনেক উপর দিয়ে চলে

যাচ্ছে তথ্যগুলো।’

‘ও, আচ্ছা, আচ্ছা! আপনি জানতে চান জিনিসটা কাজ করে কি না, এই তো?’ মৃদু হাসলেন ডক্টর ইমতিয়াজ, বুঝতে পেরেছেন, উলুবনে মুক্তো ছড়াতে যাচ্ছিলেন তিনি। একটা ওভারকোট গায়ে চড়ালেন তিনি। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘করে। আপনার সহকারীকে নিয়ে তৈরি হয়ে আসুন, দেরি না করে রওনা হয়ে যাব আমরা টার্গেট প্র্যাকটিস করতে।’

তীব্রতায় ফিরে আরও একটা করে সোয়েটার গায়ে দিল রানা ও তারেক মাহমুদ, তারপর আবার বের হলো। খানকে আশপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে আপনমনে জিজ্ঞেস করল রানা, ‘গেল কোথায় লোকটা?’

‘দুপুরে দেখলাম ছিপ-বড়শি নিয়ে হ্রদের দিকে যাচ্ছে,’ বলল মাহমুদ, ‘রাতে রানার জন্যে মাছ ধরতে বোধহয়।’

ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজের ‘টার্গেট রেঞ্জ’ প্রায় একমাইল দূরে। ক্রমে উপরে উঠে যাওয়া অব্যবহৃত পাহাড়ি হাঁটা-পথে একটানা একঘণ্টা চড়াই ভেঙে তিনটে মাঝারি উচ্চতার পাহাড় ডিঙিয়ে চতুর্থ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে ওখানে পৌঁছাতে হলো ওদের।

‘এসে গেছি,’ গভীর একটা চওড়া খাদের কিনারায় থেমে বললেন ডক্টর। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন।

কিনারা থেকে সরাসরি অন্তত আটশো ফুট নীচে নেমে গেছে খাদের খাড়া দেয়াল। দুশো গজ দূরে একই সমান উচ্চতায় খাদের ওদিকের কিনারা। ওখানে বড় ধরনের ভূমিধস হয়েছিল। কিনারা থেকে ঝোপঝাড়, বড়বড় গাছ ভেঙে নিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়েছে প্রকাণ্ড সব পাথর-খণ্ড, দগদগে ঘায়ের মত ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে জায়গাটা।

‘ওই দেখুন, ওটা আমার সনিক মিরাকলের কার্যকারিতার জলজ্যন্ত প্রমাণ,’ আঙুল তুলে ভূমিধসের জায়গাটা দেখালেন

ডক্টর ইমতিয়াজ ।

‘আমরা নিজেরা একবার অস্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই, ডক্টর,’ নরম সুরে বলল রানা । তবে বলবার সুরে বুঝিয়ে দিল, এ ছাড়া শুধু লেকচারে সন্তুষ্ট হবে না ও ।

মাথা দোলালেন ডক্টর, মাফলারটা একহাতে ভালমত পেঁচিয়ে নিলেন গলায় । ‘নিশ্চয়ই দেখবেন, মিস্টার রানা । ওদিকের ঢালে ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছেন? ওই যে, যেটার মাথায় দুটো শকুন বসে আছে?’

‘পাচ্ছি ।’

‘এবার খেয়াল করে দেখুন ।’ অস্ত্রটা কাঁধে তুললেন ডক্টর ইমতিয়াজ, ডানহাতের কনুই ভাঁজ করে উপরে উঠিয়ে বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে চাপ দিলেন স্টকের লাল বাটনে । মনে হলো স্টকের ভিতরে ব্যস্ত হয়ে গুঞ্জন তুলেছে অসংখ্য ভ্রমর ।

খাদের ওদিকে তাকিয়ে গাছটাকে ছিটকে হাজারো টুকরো হয়ে যেতে দেখল বিস্মিত রানা ও মাহমুদ । ঘন কালো ধোয়ার কুণ্ডলীটা ছিঁড়েখুঁড়ে দক্ষিণে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জোরালো বাতাস ।

‘মিস্টার মাহমুদ, এবার আপনি ধরুন দেখি,’ ক্যাপ্টেনের হাতে সনিক মিরাকল ধরিয়ে দিলেন ডক্টর ইমতিয়াজ, কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছলেন হাতের উল্টোপিঠে । ‘ওই পাথরটায় তাক করুন । দেখতে পাচ্ছেন? ওই যে ওটা—সবচেয়ে বড়টা । যেটার একটা পাশ চ্যাপ্টা । দেখুন লাগাতে পারেন কি না! রিকয়েল নেই, নিশ্চিন্তে মারুন ।’

নার্ভাস চেহারায় সনিক মিরাকল কাঁধে ঠেকিয়ে লক্ষ্যস্থির করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, তারপর ডক্টরের মত করে চাপ দিল লাল বোতামে । গুঞ্জন উঠল স্টকের ভিতর ।

এবারের বিস্ফোরণের আওয়াজটা হলো আগের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ, অনেক জোরালো । চারটে অসমান খণ্ডে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল নিরেট বোল্ডার ।

রানার দিকে তাকালেন ডক্টর ইমতিয়াজ । ‘এবার আপনি, মিস্টার রানা । নিজে ব্যবহার করে দেখুন এই মিরাকলের ক্ষমতা কতখানি । আপনার সঙ্গীর চেয়ে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদে আরও দক্ষ, কাজেই কঠিন টার্গেটই দিচ্ছি—ওই দূরের টিলার চূড়ায় একটা মরা গাছ দেখতে পাচ্ছেন? পারবেন ওটা উড়িয়ে দিতে?’

‘চেষ্টা করে দেখতে পারি ।’ ক্যাপ্টেন মাহমুদের হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে কাঁধে তুলল রানা । ওভারকোটের পকেটে দু’হাত ভরে নিশ্চিন্ত চেহারায় দূরের গাছটার দিকে তাকালেন ডক্টর ইমতিয়াজ ।

বাটন স্পর্শ করল রানা । আবার সেই গুঞ্জন উঠল, তার পরপরই টুকরো টুকরো হয়ে নানাদিকে ছিটকে গেল দূরের ওই গাছ । বিস্ফোরণের আওয়াজটা এসে পৌঁছুল দেড় সেকেন্ড পর ।

‘সন্তুষ্ট?’ কৌতুকভরে রানার চোখে তাকালেন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী । ‘চলুন, ফেরা যাক । মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে ।’ রানার হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, ‘ফেরার আগে একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে ।’

কয়েক পা সরে পাহাড়ের মাথায় খাদের ধারে পড়ে থাকা পাথরগুলোর কাছে থামলেন ডক্টর ইমতিয়াজ, দু’হাতে শক্ত করে ব্যারেলটা ধরে মাথার উপর তুলে ফেললেন সনিক মিরাকল, তারপর রানা কিংবা তারেক বাধা দেবার আগেই গায়ের জোরে নামিয়ে আনলেন ওটা পাথরগুলোর উপর । ফেটে গেল প্লাস্টিকের বাস্ক, ওটার ভিতর থেকে খসে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল ভাঙা ট্রানযিস্টর, ক্যাপাসিটর ও অসংখ্য ইলেকট্রনিক সার্কিট ও যন্ত্রাংশ ।

আরও কয়েকবার আছড়ে অস্ত্রটাকে ভাঙাচোরা ধাতব নল ও কাঠের জঞ্জাল বানিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক, যখন বুঝলেন ওটা আর কারও কোনও কাজে আসবে না, তখন ছুঁড়ে ফেলে দিলেন

খাদের ভিতর। চোখের পলকে নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল সনিক মিরাকলের ধবংসাবশেষ। একটু পর শক্ত কিছুর উপর ওটার পতনের আওয়াজ ভেসে এলো আবছাভাবে।

‘কেন, ডক্টর?’ নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ফিরে চলুন, তারপর বলব,’ ঘুরে দাঁড়ালেন ডক্টর ইমতিয়াজ, গম্ভীর চেহারায় রওনা হয়ে গেলেন ফিরতি পথে।

ঝামঝাম করে বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙে। বাড়ল বাতাসের জোর।

রানার পাশে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাপ্টেন মাহমুদ বলল, ‘পাগল নাকি লোকটা!’

জবাব দিল না রানা।

ওরা তাঁবুতে ফিরে পোশাক পাল্টানোর পনেরো মিনিট পর নড়ে উঠল তাঁবুর ফ্ল্যাপ, ভিতরে ঢুকলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ।

‘বসুন,’ তাঁকে নিজের বিছানাটা দেখাল রানা।

মাথা নাড়লেন ডক্টর। ‘বসব না। আলাপটা সেরে ফেলতে এলাম।’

‘বলুন?’

‘আমি কি বাংলাদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাচ্ছি?’ রানার চোখে তাকালেন ডক্টর ইমতিয়াজ, রানা চুপ করে থাকায় আবার বললেন, ‘অত্যাধুনিক একটা ল্যাবোরেটরি দিতে হবে আমাকে, সেই সঙ্গে সমস্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। বদলে আপনাদের হাতে তুলে দেব আমি সনিক মিরাকল তৈরির নকশা।’

চুপচাপ কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, ‘আমাদের দেশে একটা মাত্র ল্যাবোরেটরি আছে, যেটাতে আধুনিক সবরকম ইকুইপমেন্ট পাবেন আপনি। তবে ওখানে যিনি গবেষণা করেন, তাঁকে কাজ করতে হয় কড়া নিরাপত্তা ও প্রহরার মধ্যে, ল্যাবোরেটরির সমস্ত নিয়ম মেনে। ওখানে

অ্যারোনটিক্সের ওপর রিসার্চ করছেন...’

‘কোনও আপত্তি নেই আমার। ...অ্যারোনটিকাল সেক্টরেও কিছু কাজ করব আমি। আমার যে-কোনও আবিষ্কার নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা। কথা দিতে পারি, কোনও আপত্তি করব না।’

‘ডক্টর নাদিরার নাম শুনেছেন?’ জিজ্ঞেস করল রানা। জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই বলল, ‘চিনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া দুটো ঈগল ফাইটার জেট নিয়ে আমাদের একমাত্র টপ-প্রায়োরিটি সিক্রেট ল্যাবোরেটরিতে গবেষণা করছেন তিনি। আপনি নিজেও হয়তো আগ্রহী হবেন তাঁর কাজে। “দুরন্ত ঈগল” প্রজেক্টে আপনার মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে পেলে বোধহয় কৃতজ্ঞ বোধ করবে আমাদের সরকার।’

একটু দ্বিধায় ভুগলেন ডক্টর ইমতিয়াজ, দ্রুত কুঁচকে বললেন, ‘নামটা চেনা চেনা লাগছে। একটা গুজব কানে এসেছে বটে আমার, বাংলাদেশ নাকি চিনের সাহায্য-সহযোগিতায় একটা সুপার ফাইটার জেট তৈরি করেছে। ডক্টর নাদিরা বোধহয় ওগুলোর ডেভেলপমেন্ট নিয়েই কাজ করছেন? ল্যাবোরেটরি শেয়ার করতে ভাল লাগবে না, তবে এর চেয়ে অনেক কঠিন শর্তেও রাজি না হয়ে আসলে উপায় নেই আমার। পালাতে পালাতে পেরেশান হয়ে গেছি আমি।’

‘আপনি চান আমরা আপনাকে নিয়ে যাই আমাদের দেশে,’ বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, ‘আর সেজন্যেই নষ্ট করে ফেললেন আপনার সনিক মিরাকল?’

‘হ্যাঁ।’ নিজের মাথায় টোকা দিলেন ডক্টর ইমতিয়াজ। ‘ওটার ডিযাইন আছে শুধু এখানে। আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় আর নিজের ইচ্ছেমত গবেষণার সুযোগ দেবার বদলে ডিযাইনটা পেতে পারে বাংলাদেশ।’

‘ভালমত না ভেবে ঝটপট এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেয়া

আমার পক্ষে সম্ভব নয়,’ বলল রানা। ‘বসের সঙ্গে যোগাযোগ করব, আশা করি কালকেই জানতে পারবেন আমাদের সিদ্ধান্ত।’

মাথা দোলালেন ডক্টর ইমতিয়াজ। ‘বেশ। বহু পথ হেঁটেছি আমি!’ ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, মনে হলো হঠাৎ করেই যেন রিক্ত-নিঃশ্বাস হয়ে পড়েছেন। তাঁরু থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বললেন, ‘আমাকে আমার ল্যাবরেটরিতেই পাবেন।’

‘সিদ্ধান্ত যা-ই হয়, কাল দুপুরের আগে আপনাকে জানিয়ে দেব আমি,’ পিছন থেকে বলল রানা।

কেটে গেল বাদলঝরা সন্ধ্যা, নামল নিকষ কালো রাতের আঁধার। এখনও ঝরঝর ঝরছে বারিধারা।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে অস্থির বোধ করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, বারবার ভাবল মাসুদ ভাইকে ডেকে তোলে, কিন্তু এত গভীর ঘুম থেকে তুলতে শেষপর্যন্ত ইচ্ছে হলো না। হঠাৎ এত ঘুম কেন, ভেবে একটু অবাকই লাগল ওর।

দুপুরের আগে অবশেষে গভীর ঘুম থেকে জাগল রানা। শুয়ে থেকেই হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল ও, বিড়বিড় করে বলল, ‘মরে গেছি! বাবারে! হাড় মুড়মুড়ি ব্যারামে ধরেছে আমাকে! সারা শরীর টিসটিস করছে ব্যথায়!’ আশ্বে আশ্বে উঠে বসল ও শক্ত মেঝেতে, চোখ পিটপিট করে দেখল ক্যাপ্টেন মাহমুদকে, তারপর ঘুম-জড়ানো স্বরে বলল, ‘আলতাফকে রেডিও করে বলো, এসে নিয়ে যাক আমাদেরকে এখান থেকে।’

হ্যাভারস্যাক খুলে খুদে ট্রান্সমিটারটা বের করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। ‘সঙ্গে নিশ্চয়ই ডক্টর ইমতিয়াজকেও নিচ্ছি আমরা?’

আড়ষ্টভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা। ‘সেটাই তো আমাদের মিশন, তা-ই না?’

তিন

পরদিন সকাল সাড়ে ন’টা।

বসের ডাক পাওয়ার জন্য নিজের অফিস কামরায় তারেক মাহমুদকে নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। একটু আগে দু-কাপ কফি রেখে গেছে রানার সেক্রেটারি মিথিলা। কফির কাপে মৃদু চুমুক দিয়ে টেবিলের ওদিকে বসা ক্যাপ্টেনের দিকে মেজর জেনারেলের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বলল, ‘দোয়া-দরুদ যা জানো পড়তে থাকো, মাহমুদ। একটু পরেই পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল জানিয়ে দেয়া হবে তোমাকে।’

কফির কাপটায় তৃতীয় চুমুক দিতে যাচ্ছিল রানা, খ্যানখেনে সুরে বেজে উঠল ইন্টারকম। একটা বাটন টিপে স্পিকার অন করল ও। ইলোরার কণ্ঠ ভেসে এল। তাগাদার ভঙ্গিতে বলল সে, ‘মাসুদ রানা, ক্যাপ্টেন মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে এক্ষুনি তোমাকে দেখা করতে বলেছেন বস। ইমিডিয়েটলি।’

‘ও, বস?’ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। মধু-ঝরানো কণ্ঠে বলল, ‘তোমার আর্জেন্সি দেখে আমি ভেবেছিলাম ডাকছ তুমি!’

‘সাবধান!’ নিচুকণ্ঠে বলল ইলোরা। ‘বসের লাইন কিন্তু খোলা!’

হেসে উঠল রানা। ‘ওসব চাপাবাজি রাখো তো, সুন্দরী। আগে বলো আজ রাতে কোথায় আমরা একসঙ্গে ডিনার...’

‘ডিনারের অনেক দেরি আছে,’ ভারী, গভীর কণ্ঠ ভেসে এল ইন্টারকমে। আঁকে উঠল রানা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, কাপ থেকে ছলকে টেবিলের উপর পড়ল কফি।

‘আপাতত এসো, হাতের কাজটা সেরে নেয়া যাক,’ বলেই খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহাত খান।

খিলখিল করে হেসে উঠল মিথিলা।

হাস্যরতা সেক্রেটারির দিকে জ্রু কুঁচকে কটমট করে তাকিয়ে তিন সেকেন্ডে ওকে ছাই বানিয়ে দিল রানা, তারপর তারেক মাহমুদকে ইশারা করে বেরিয়ে পড়ল নিজের অফিস-কামরা থেকে। কফি ফেলেই ছুটল ওরা লিফটের দিকে।

ইলোরার কৌতুকপূর্ণ তির্যকদৃষ্টি গায়ে না মেখে মেজর জেনারেলের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, টাইয়ের নট ঠিক করে নিয়ে দু’বার টোকা দিল দরজায়।

‘কাম ইন!’ ভেসে এলো পরিচিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠ।

রানার পিছু নিয়ে ঢুকল তারেক মাহমুদ, মুখটা শুকনো।

‘বসো।’ সিগার তাক করে চেয়ার দেখালেন রাহাত খান। ওরা বসতেই রানার দিকে তাকালেন। ‘ডক্টর ইমতিয়াজকে ছেড়ে এসেছ কোথায়?’

‘কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে, স্যর,’ জবাব দিল রানা। ‘আমাদের তুহীন আর রূপম তার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।’

‘বডিগার্ডকে ওই দুর্গম এলাকায় ফেলে আসতে গড়িমসি করেনি ডক্টর?’

‘সামান্যই। যুক্তিবাদী মানুষ, স্যর। বডিগার্ড লোকটা হরিণ শিকার করতে বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে তার ঠিক নেই; এদিকে সি-পুন হাজির। ভারতীয় এলাকায় তার অপেক্ষায় অনির্দিষ্ট সময় বসে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এসব বিবেচনা করে অখুশি হলেও ওর জন্যে একটা চিঠি লিখে রেখে রওনা হয়ে গেছে।’

সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে মুখটা আড়াল করলেন মেজর জেনারেল। ‘মাহমুদ, রিপোর্ট লেখা হয়েছে তোমার?’

‘জী, স্যর।’

‘তা হলে, মাহমুদ, রিপোর্টে যা লিখেছ তা মুখে শোনাও আগে।’

নড়েচড়ে বসল ক্যাপ্টেন।

‘আমাদের পুরো অ্যাসাইনমেন্ট পরিকল্পনা-মাফিক এগিয়েছে, স্যর,’ সম্ভৃষ্টির সঙ্গে বলল সে। ‘অ্যাসাইনমেন্ট টোটালি সাকসেসফুল, স্যর। সনিক মিরাকলটা অবশ্য সঙ্গে করে আনতে পারিনি আমরা। তবে ডক্টর ইমতিয়াজ যেহেতু ওটার নাড়ি-নক্ষত্র জানেন, কাজেই বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। শীঘ্রি আমরা আরেকটা সনিক মিরাকল...’

‘ওটা যে-কেউ বানাতে পারে,’ উৎসাহী তরুণকে থামিয়ে দিলেন নিরাসক্ত রাহাত খান।

‘স্যর?’ চোখ বড় বড় করে একবার রাহাত খান, আরেকবার রানাকে দেখল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। ‘কিন্তু ওরকম একটা অস্ত্র...’

রানার দিক থেকে তারেকের দিকে সিগার তাক করলেন মেজর জেনারেল। ‘রানা, ওকে বলো ওটা কী।’

‘তুমি একটা খেলনা দেখেছ, মাহমুদ,’ বলল রানা। ‘খেলনাটা গুঞ্জন তোলে, আর গাছ বা পাথর বিস্ফোরিত হয়। তুমি একবারও খেয়াল করোনি কোথায় আমরা লক্ষ্যস্থির করব, সেটা ঠিক করে দিচ্ছিল স্বয়ং ইসমাইল ইমতিয়াজ। গোটা ব্যাপারটা ছিল একটা পাকিস্তানী ধাপ্লাবাজি।’

‘জী?’

‘ধাপ্লাবাজির খেলায় ওর বেঁধে দেয়া নিয়মে না খেললে তুমিও ধরতে পারতে,’ বলল রানা। ‘যখন আমার পালা এলো, মরা গাছটায় তাক করতে বলল আমাকে, মনে আছে?’ মাহমুদ মাথা বাঁকানোয় বলে চলল রানা, ‘ওই গাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ফাঁকা জায়গায় তাক করলাম আমি। তাতে ফলাফল পাল্টায়নি, ঠিকই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে গাছটা।’

বারকয়েক হাঁ করে আবার মুখ বন্ধ করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ,

কথা বলতে পারল না। তারপর ভাষা ফিরে পেল, ‘কিন্তু...
কিন্তু...’

‘ডিনামাইট,’ এক কথায় জবাব দিল রানা। ‘আর সেজন্যেই আমাদের দিক থেকে টার্গেটের দিকে বাতাস বয়ে যাবে এমন একটা দিন বেছেছিল লোকটা। নইলে ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসত, ওর চালিয়াতি ধরে ফেলতাম আমরা। নিজেদের পছন্দমত কোনও টার্গেট বেছে নিয়ে আরও একটা-দুটো গুলি করার আবদার যাতে না করতে পারি, সেজন্যে ডেমনস্ট্রেশন হয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলেছিল খেলনাটা, পরে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ রাখেনি। বৃষ্টির ছুতোয় আমাদের নিয়ে ফিরতি পথ ধরেছিল ঝটপট।’

রানা চুপ করে যাওয়ার পরও কিছু বললেন না রাহাত খান। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, ‘যা বললেন সেসব কি অনুমান, নাকি প্রমাণও আছে এসবের, মাসুদ ভাই?’

‘প্রমাণ আছে,’ বলল রানা। ‘রাতে তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়লে, চড়াই-উতরাই ভেঙে আমি ফিরে গিয়েছিলাম ওই খাদের ধারে। খাদ পার হয়ে টার্গেটগুলোর গোড়া থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। ওখানে একজনের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে ফিরতে প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যেই গতকাল ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছে আমার। সংগ্রহ করা নমুনাগুলো আমাদের ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ফুলাস আর্থ আর মোম মাখানো কাগজ পাওয়া গেছে ওগুলোতে।’

‘ফুলাস আর্থ?’

‘তিনভাগ নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে একভাগ ফুলাস আর্থ দেয়া হয় এ-ধরনের ডিনামাইটে। মিশ্রণটাকে একসঙ্গে রাখতে মুড়ে রাখা হয় মোম মাখানো কাগজ দিয়ে।’

সিগারে টান দিয়ে ওটা নিভে গেছে দেখে অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রাখলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, তারপর জিজ্ঞেস

করলেন, ‘ঠিক সময়ে ওগুলো ফাটাল কী করে ওই নকল ইসমাইল ইমতিয়াজ?’

‘ও ফাটায়নি, স্যর। ও শুধু ইশারা দিয়েছে। নিজে যখন লক্ষ্যস্থির করল, তার আগে মাফলার ঠিক করেছিল। তারেকের বেলায় কপাল থেকে ঘাম মুছেছিল। আমার বেলায় ওভারকোটের পকেটে পুরে দিয়েছিল দু’হাত। খাদের ওদিকের পাড়ে ফিল্ডগ্লাস নিয়ে লুকিয়ে বসে ছিল তার সহকারী। ইশারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডেটোনেটর অ্যাকটিভেট করেছে সে।’

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, ‘আপনি কি শিওর, না আন্দাজ করছেন, মাসুদ ভাই?’

‘শিওর। রাতে ওখানে গাফফার খানের ক্যাম্পে গিয়েছিলাম আমি।’

‘কপাল ভাল যে বেঁচে ফিরতে পেরেছেন,’ অস্ফুট স্বরে বলল তরুণ ক্যাপ্টেন। ‘লোকটার হাতের টিপ সাজ্জাতিক।’

ওর কথাটা শুনতে পেয়ে রানা বলল, ‘সত্যিই, হাতের টিপ খারাপ ছিল না লোকটার।’

রানার মুখে “ছিল” শুনে একটু থমকে গেল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। তার মানে বদমাশটা খতম! সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, ‘এতসব কেন করল ওরা, মাসুদ ভাই?’

‘আসাম থেকে নকল বিজ্ঞানীকে নিয়ে ফেরত আসবার আগেই ওই প্রশ্নের জবাবটা বুঝে ফেলা উচিত ছিল তোমার,’ গম্ভীর চেহারায় বললেন রাহাত খান।

‘কিন্তু আমাদেরকে ডক্টরের যে ডোশিয়ে দেখানো হয়েছে, তাতে সাঁটা ছবি আর ওই লোকের চেহারা তো একদম একইরকম, স্যর!’ বিড়বিড় করল মাহমুদ।

‘টু কপি,’ বলল রানা। ‘কিন্তু নিখুঁত প্লাস্টিক সার্জারিতেও সূক্ষ্ম সাদা দাগ থেকে যায়। ওই লোকটার মুখের বামপাশেও ওরকম একটা চুলের মত সরু দাগ ছিল। ইসমাইল ইমতিয়াজ

দুনিয়ার অন্যতম সেরা একজন ফিফিসিস্ট। কয়েক মাস আগে নিখোঁজ হয়ে গেছেন তিনি, অথচ তাঁকে জোরেশোরে খুঁজছে না পাকিস্তান সরকার, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার? বিজ্ঞানী-উদ্ধারের ব্যাপারে পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের সেরকম কোনও তৎপরতার খবর আসেনি আমাদের কাছে। ওরকম কোনও তথ্য পাওয়া গেলে ব্রিফিংয়ের সময় উল্লেখ করা হতো। এ থেকে আমি ধরে নিই, আসল বিজ্ঞানী পালাননি। তা হলে ওই লোকটা কে? অ্যাসাইনমেন্ট দেবার সময় এই অফিসেই আমরা জানতে পারি, ট্রান্সমিশনটা আর কারও রিসিভ করার কথা নয়। লোকটার তাঁবুতে আমরা যখন ঢুকলাম তখন একটা ট্রান্সমিটার দেখেছিলাম। ওই আমেরিকান ট্রান্সমিটার বলে দিচ্ছে লোকটার পরিচয়।

‘ঠিক!’ ঘন ঘন কয়েকটা ঢোক গিলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। ‘সিআইএ!’ চট করে রাহাত খানের দিকে তাকাল সে। ‘স্যর, আমি কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?’

‘করো।’

‘আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি তো জেনে গেছে ওরা! এ-ক’দিনে যত গোপন তথ্য...’

হাসির সূক্ষ্ম রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল মেজর জেনারেলের ঠোঁট থেকে। ‘যখন বিজ্ঞানীকে ফ্রিকোয়েন্সি জানানো হয়, তার পরপরই আমাদের অফিশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টে ফেলেছি আমরা।’ তাকালেন তিনি রানার দিকে। ‘গো অন, রানা।’

‘নকল বিজ্ঞানী বলেছিল, পার্টসগুলো তৈরি করতে হবে অত্যাধুনিক গবেষণাগারে, তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। রাজনৈতিক আশ্রয় ও গবেষণার সুযোগ চেয়েছিল সে। আসলে চেয়েছিল আমাদের টপ সিকিউরিটি গবেষণাগারে ঢুকতে। অ্যারোনটিকাল সেক্টরেও কাজ করতে চায় জানিয়ে আমাকে খেলিয়ে তুলতে চাইল নকল ডক্টর ইমতিয়াজ। আমিও টোপ

ফেললাম, বললাম: ডক্টর নাদিরার সঙ্গে দুরন্ত ঈগল প্রজেক্টে হয়তো রিসার্চ করতে পারবে সে। গড়িমসির ভাব করে টোপটা গিলল। দুরন্ত ঈগলের ব্যাপারে চিনের কাছ থেকে কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে না সিআইএ, কাজেই নজর দিয়েছিল ওরা আমাদের ওপর। হয়তো ধরে নিয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বের গরীব এই দেশটা থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হবে। আমরা যখন জানতে পারতাম বিস্ময়কর অস্ত্র সনিক মিরাকল আসলে ভুয়া, ততক্ষণে আমেরিকার দালাল নকল ইসমাইল ইমতিয়াজ চলে যেত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অ্যাকসেস কোড জেনে নিয়ে ল্যাবোরেটরির কম্পিউটার টার্মিনালে বসতে পারলে ডিভিডিতে গোপন গবেষণার যাবতীয় তথ্য রাইট করে নিয়ে সরে পড়ার প্ল্যান ছিল ওর। তার পালানোর ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা হয়েছিল নিশ্চয়ই। টপ প্রায়োরিটি রিসার্চ ল্যাবোরেটরির সিকিউরিটি সিস্টেম নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছেন আমাদের বিশেষজ্ঞরা। আমরা আশা করছি সিকিউরিটি ফ্ল-র ব্যাপারে শীঘ্রি মুখ খুলবে নকল বিজ্ঞানী, জানা যাবে কীভাবে কী করার ইচ্ছে ছিল তার। এরইমধ্যে সিআইএ-র পুটিং সম্বন্ধে মুখ খুলেছে লোকটা। জানা গেছে পাকিস্তানি সামরিক সরকার আমেরিকার সুনজরে থাকতে সিআইএ-র কথায় নেচেছে। পত্রিকার খবর, গাড়িবোমা, আত্মঘাতী বোমা—সব ভুয়া।’

রানা চুপ করে যাওয়ার পর নীরবতা নামল বিসিআই চিফের অফিসে। মাঘের শীতেও দরদর করে ঘামছে তারেক মাহমুদ, বারকয়েক ঢোক গিলল। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ওকে নেয়া হবে না বিসিআই-এ। জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ও। লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল ছেলেটা, মুখ নিচু করে কোলের উপর ফেলে রাখা হাতের দিকে চেয়ে বসে থাকল চুপচাপ।

‘তুমি এসো, তারেক,’ জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন রাহাত

www.BanglaBook.org

খান।

চমকে উঠে দাঁড়াল তরুণ ক্যাপ্টেন, বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে মাথা। সালাম দিয়ে স্থলিত পায়ে বেরিয়ে চলে গেল।

রানার দিকে তাকালেন বিসিআই চিফ। ‘ওয়েল, রানা? হোয়াট অ্যাবাউট হিম?’

‘ওকে দিয়ে হবে, স্যর,’ নির্দিধায় বলল রানা, ‘সাহস আছে ওর। দেশপ্রেমেরও কমতি নেই, স্যর। বাকিটুকু ঠিকই শিখে নেবে।’

‘আচ্ছা। চিঠি পরে যাবে, তবে ওর পরীক্ষার ফলাফল আনঅফিশিয়ালি ওকে জানিয়ে দিতে পারো তুমি।’ পাশ থেকে মোটা একটা ফাইল টেনে নিলেন রাহাত খান, মনোনিবেশ করলেন ওতে।

এর মানে, এবার বিদায় হও, বাছা। আমার কাজ আছে।

নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, পা টিপে বেরিয়ে এলো বুড়ো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচা থেকে। দরজাটা ভিড়িয়ে দেয়ার আগে কানে এল, মৃদুকণ্ঠে বললেন ওর পিতৃসম ব্যক্তিটি, ‘ইট উঅয আ গুড জব, মাই বয়!’

‘থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর,’ বলে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। কউর বুড়োর প্রশংসা পেয়ে বুকটা ভরে গেছে ওর আনন্দে।

www.BanglaBook.org

Bangla
Book.org